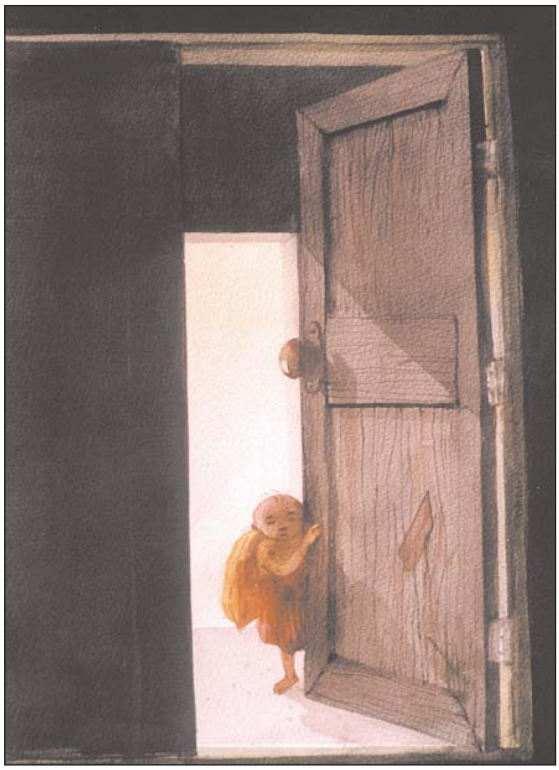

টোকাই

শাহাদত চৌধুরী

যদি টোকাই জন্মদিন পালন করতো তবে টোকাইয়ের বয়স হতো ৩৩ বছর। টোকাই বাংলাদেশের বয়সী। হিসাবটা রনবী ও আমি করেছিলাম। পঁচিশ বছর আগে ওয়ারীর লালমনি স্ট্রিটের রনবীর ভাড়া করা ফ্ল্যাটের বসার ঘরে বসে প্ল্যানের সময় বয়স ঠিক হয় আট বছর। পরিকল্পনা করে না, রনবী'র কল্পজগতে একাত্তরে জন্ম হওয়া শিশুদের একটা স্থান আছে। দৃশ্যপটটা আরো একটু গভীর বা অন্যরকম। একাত্তরের ঢাকা শহর প্রথম পর্যায়টা ছিল অরক্ষিত, রিক্ত। হায়নার দখলে। পুরো বাংলাদেশই গেল হায়নার ছোবলের নিচে। ২৫ শে মার্চ রাতে বস্তিগুলোতে হত্যা করা হয় লক্ষ মানুষকে। এটা পরিকল্পিত হত্যা। বস্তিবাসীরাই রাজপথে অবরোধ গড়ে তোলে, মিটিংয়ে ভিড় করে। স্বাধীনতার দাবি তোলে। শহরের বাড়তি লোক কমিয়ে ফেলতে হবে। বাড়তি এই টোকাইরা, তাদের বাবা-মা।

একাত্তরের পিতা-মাতাহীন একটি বেঁচে থাকা শিশুই টোকাই, শহীদ পিতা-মাতার শেষ চিহ্ন। ত্রিশ লাখ শহীদের যে কোনো এক দম্পতি হতে পারে টোকাইয়ের পিতা-মাতা। একাত্তরের রিক্ত বাংলাদেশের প্রতীক টোকাই। যে ছবিটি দেখা যায় মৃত মায়ের পাশে বসে কাঁদছে একটি শিশু। হতে পারে সেটাই টোকাই।

একাত্তরের বেদনা টোকাই। একাত্তরের প্রতিরোধের প্রতীক টোকাই। বেঁচে থাকার নিরন্তর সংগ্রামের নাম টোকাই।

টোকাইয়ের অন্যরূপটি পাঠক ভেবে নেয়, মেনে নেয় তা হলো ওর অবস্থানটি। ও সমাজে আছে, রাস্তায় আছে। ও নিজেকে নিয়ে ভাবে না, অবস্থান জাহির করে না। ওর চাহিদা নেই, কিছুই যেন লাগে না। কেউ খবর রাখছে না ও কিভাবে, কি খেয়ে বেঁচে আছে! কিন্তু মেনে নিচ্ছে টোকাই আছে!

মানব উন্নয়নের কথা বলা হয় বিশ্বফোরাম থেকে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ওরা টোকাই কেন? মায়া করেন কিন্তু তিনিও ক্ষমতায় গেলে অক্ষম হয়ে যান। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বলেন, ওরা টোকাই না 'পথকলি'। পথের ঠিকানা না বদলে কলি বললে তা কলি হবে না। শিশুশ্রমের জন্য মায়া কান্না কাঁদছে বিশ্বফোরাম। তারা আমাদের গার্মেন্টস শিল্প থেকে বের করছে শিশুশ্রমিক বলে! টোকাইকে রাজপথ থেকে কোথায় নিয়ে যাবে? ওর খাদ্যের অন্বেষণটা শ্রম নয়? ও খাওয়া জোগাড় করে শ্রমহীনভাবে!

আসলে টোকাই রনবীর মমতায় বেঁচে আছে। ছোট মানুষটি কি আর খায়, পরনে ছোট কাপড়টিও তাই। এযেন বাংলাদেশই। ছোট দেশ, চাহিদা সামান্য। দু' বেলা দু' মুঠো ভাত। এটাই বলা হয় কথায় কথায়। কিন্তু চারদিকে উঠছে স্কাই-স্ক্রপার, রাস্তায় সবচে' দামী গাড়ির বহর। কিন্তু দরিদ্রতম দেশ দারিদ্রতমই রয়ে গেছে, আজ তেত্রিশ বছরে একটুও পরিবর্তন কেউ ঘটাতে পারেনি। এদিকে নেতারা বড় হচ্ছে, বড় বড় পরিবার গড়ে উঠছে। রাজনীতিবিদ রাষ্ট্রশাসকরা তাদের সাঙ্গপাঙ্গ মাস্তানদের নিয়ে পরিবার গড়ে তুলছে। ডাইনেস্টি ঘোষণা করছে। অথচ এক পুরুষ আগের হিসাব নিলে নিজেরা নিজেদের চিনবে না। এরা বেড়ে উঠছে কিন্তু টোকাইরা একমাত্র বাংলাদেশের মৌলিক ধারাবাহিক চরিত্র। তার শরীর বয়স বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উপাত্ত চিহ্ন হিসেবে স্থিত হয়ে আছে। বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির মতই এক আকারেই রয়ে গেছে।

রনবীও হয়তো ভাবেন যেদিন এ দেশের অর্থনীতিবিদরা নতুন তথ্য যুক্ত করবেন, সেদিন টোকাইকেও দেখবো না। টোকাইয়ের আকার বৃদ্ধি পাবে।

টোকাই বাংলাদেশের প্রতিরূপ। রনবী ২৫ বছর ধরে এ চিত্রটি বদলাতে পারেননি। কিন্তু তিনি বদলাতে চান। জানি না কবে তিনি বদলাতে পারবেন! পারবেন কি রনবী?

টোকাই পঁচিশ বছর ধরেই একই প্রশ্ন হয়ে আছে আমাদের সামনে। কতদিন থাকবে?

আমি+টোকাই+২৫ বছর

রফিকুন নবী

তিন কমরেড। গলায় গলায় ভাব। জান-ই দোস্ত। একসঙ্গে চলে। একজন আরেকজনের পরিপূরক। তিনজনই মোটামুটি খ্যাতিমান। দেশজুড়ে প্রায় সবাই চিনে। এই তিনজনের একজন অবশ্য মূল কান্ডারী। তার অবস্থান নৌকার পেছন-গলুতে বসে হাল ধরার।

কান্ডারীর ভূমিকায় যে, তার নাম রফিকুন নবী। তার মূল কাজ ছবি আঁকা। ছবি আঁকার নানাবিধ মাধ্যমকে নিয়ে কাজ করার পাশাপাশি আরও হরেক দিকে নাক গলিয়ে অনেকের বিরাগভাজন হওয়া তার স্বভাব। দ্বিতীয়জন 'রনবী'। রফিকুন নবীর একটা দিক এই নামের আওতায় পরিচালিত হয়। তিন নম্বর হলো 'টোকাই'। রফিকুন নবী এবং রনবীর সাজানো একটি চরিত্র। স্বভাবে একাধারে পাকা, ফাজিল এবং পন্ডিত। এই হলো তিন কমরেডের পরিচয়। কেউ কাউকে ছাড়া চলতে পারে না।'

কেউ যখন আমাকে টোকাই, কার্টুন, ছবি ইত্যাদি এবং নামধাম নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করে, তখন আমি প্রায়শই এইভাবেই উত্তরটা দিয়ে থাকি। এসব নিয়ে ভাবতে গিয়ে অনেকেই জিজ্ঞেস করে, 'ভাই, শিল্পী হিসেবে 'ড্রইং' পারাটা তো আপনার জন্য জলবৎ আঁকাটা মজাদারও হয়, কিন্তু সঙ্গে যিনি মজাদার ভাষা দিয়ে সহায়তা করেন তাঁর নামটি ব্যবহার করেন না কেন? এটা তো অন্যায়, নাকি? স্বীকৃতিটা দেয়া উচিত নয় কি?'

অতএব ব্যাখ্যা দিয়ে বলি, 'শিল্পী রফিকুন নবী আঁকে, আর রনবী ব্যাপারটি ভেবে ভাষায় রূপ দেয়।' এসব শুনে খুব খুশি হয় না কেউ? একবার এক ভদ্রলোক তো খুবই মন খারাপ করেছিলেন। তাঁর ধারণা 'শিল্পীরা ভোলাভালা থাকবে, জ্ঞান গরিমার ব্যাপারটি তো তাদের থাকার কথা নয়।'

তাঁর ওইসব ধারণায় তেতে গিয়ে বলেছিলাম, 'শিল্পীরা কি মানুষ নয়রে ভাই যে, অন্যরা যা যা পারে তা তারা পারবে না। এবং শিল্পীরা কি ভাত খায় না? প্রেম করে না? জগৎকে দেখে না, জীবনকে বোঝে না?! পুরনো অতি উচ্চারিত সহজ বচনটি মনে আসায় আউড়ে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম 'দেখো, যে রাঁধতে জানে সে চুলও বাঁধতে জানে...' ইত্যাদি।

টোকাই আঁকা নিয়ে আরো নানা ধরনের কথাবার্তা চালু আছে। সে সবে বিপদের গন্ধও থাকে বৈকি! অনেকে মনে করেন, দারুণ রাজনীতি করা মানুষ। গরিব নিয়ে কথাবার্তা বলা হয় তাঁর কার্টুনে, ওরাই মূল চরিত্র। অতএব, হয় কম্যুনিস্ট নয়তো সমাজতন্ত্রের কাছাকাছি কোনো তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাসী একজন। আমি বলি- রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদিতে মন্দ দিক ভর করলে 'ফোঁস' করে ওঠা-

নির্বাচিত টোকাই

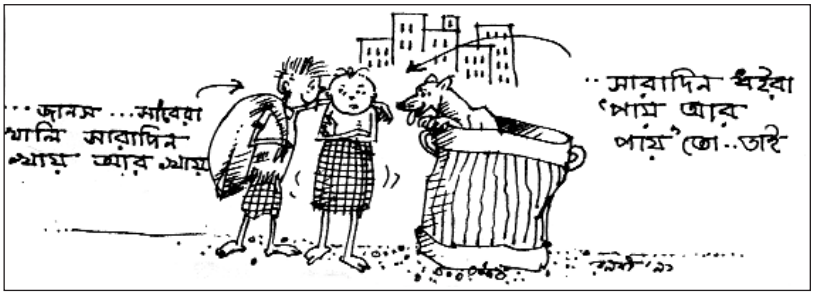

শিল্পীদের দস্তর। দেশে শিল্পাচার্য জয়নুল করেছিলেন, পটুয়া কামরুল করেছিলেন, বিদেশে শিল্পকলায় ইতিহাস হয়ে আছেন ইউরোপের নানা দেশের নানান শিল্পী বিভিন্ন যুগে। এ ক্ষেত্রে ব্রুখেল, বচ, হোগার্থ, গইয়া, পিকাসো, দমিয়ে, গিলারী, রওল্যান্ডসানসহ অনেক অনেক শিল্পী কাজ করেছেন। নির্যাতিত মানুষের দুর্গতির কথা, সামাজিক অবক্ষয়, যুদ্ধ বিগ্রহের করুণ পরিণতির কথা বলেছেন তাঁরা নিজ নিজ মাধ্যমে। কেউ চিত্রে, কেউ ব্যঙ্গচিত্রে।

আমি সে ক্ষেত্রে নিতান্তই ধুল পরিমাণ একজন। বিভিন্ন মাধ্যমে কাজ করি কখনো শখে, কখনো ঠেকে। তার মধ্যে কার্টুন একটি। কথা বলার জন্য কার্টুনকেই বেছে নিয়েছি, চিত্রকলার মূল অংশকে নয়। মূল অংশটি অন্য ধাঁচের। কলাকেন্দ্রিক। কার্টুন করতে গিয়ে ছদ্মনাম 'রনবী'কে ব্যবহার করি। যদিও ব্যাপারটি আর ছদ্মাবরণে থাকেনি মোটেও। বরং নানা দিক দিয়ে আসল নামটিই যেন কিছুটা আড়ালে থেকেছে বেশ কিছুকাল। আমি তা উপভোগই করেছি, যেমন করেছি নামটি জানাজানি হওয়াটাও।

কার্টুনের জগৎটায় রনবী নামটি ষাট দশকের মাঝামাঝি থেকে ব্যবহৃত হলেও 'টোকাই' নামটির শুরু আরো পরে, সত্তর দশরের শেষ নাগাদের। মনে হয়, এইতো সেদিনের কথা।

পাক্কা তিনটি বছর গ্রিসে ছাপচিত্রের ওপর লেখাপড়া করে দেশে ফিরলাম ঊনিশ শ' ছিয়াত্তরে। তখন দেশজুড়ে ক্ষমতার পালা বদলের পর ঝড় শেষের গুমোট। চেয়ার দখলের অভ্যাস রাষ্ট্রীয় উচ্চপর্যায়ের দেখাদেখি দেশের আনাচে-কানাচে সর্বত্র ভর করতে শুরু করেছে। ব্যাপারটি আমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হলো। আমার নিজস্ব পদটিতে তৎক্ষণাৎ যোগ দিতে পারলাম না।

গ্রিসে যাবার আগে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, দেশে ফিরলে কার্টুন, ইলাস্ট্রেশন ইত্যাদিতে আর নাক গলাবো না। শুধুই নিখাদ চিত্রকলার জগতে নিজেকে নিবেদিত রাখবো। শিক্ষকতা আর চিত্রকলাচর্চা, ব্যস- এই দুইকে পাথেয় করে নির্ভেজাল, নির্ঝঞ্ঝাট দিন যাপন করবো পরিবার-পরিজন নিয়ে।

কিন্তু বাস্তব বলে কথা। ভাবি এক হয় আর এক। চাকরির অনিশ্চয়তায় সব প্রতিজ্ঞা ভন্ডুল। সদ্য ইউরোপ থেকে ফেরা ডাঁটবাট, খাঁটি শিল্পীর অহঙ্কার সবই নিমেষে উধাও। আর্থিক টানাপড়েনে প্রতিজ্ঞা ভেঙে আবার পুরনো অভ্যাসের কাছে হাত পাতা। 'পুনঃ মূষিক ভব'। শুরু করলাম ফের প্রচ্ছদ-ইলাস্ট্রেশন ইত্যাদির কাজ। দেখলাম তিন বছরের অনুপস্থিতিতেও এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত নামটি মুছে যায়নি। 'হুঁ' বলতেই পত্র-পত্রিকা আর প্রকাশনা সংস্থার ভিড় বাড়তে শুরু করলো।

বন্ধু শাহাদত চৌধুরী তখনই ডাকসাইটে একজন পত্রিকা সম্পাদক। এবং যে সে পত্রিকার নয়, স্বাধীনতা-উত্তর পত্র-পত্রিকার জগতে সবকিছুকে নাড়া দেয়া সাড়া জাগানিয়া একটি জনপ্রিয় নাম- সাপ্তাহিক বিচিত্রা। গ্রিসে যাবার আগে পত্রিকাটিতে পকেট কার্টুন আঁকতাম। অতএব আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়েছে জেনে শাহাদত চৌধুরী আবার কার্টুনের বায়না ধরলেন।

শাহাদত চৌধুরী বাল্যবন্ধু। ঘনিষ্ঠতম। চারদিক দেখতে দেখতে আমাদের একসঙ্গে বেড়ে ওঠা। দু'জনেই দু'জনের জীবনী লেখার মতো সারা জীবনের 'ঘাট ঘাপলা'গুলিকে জানি। পরস্পরের উঠতি-পড়তিকে প্রত্যক্ষ করা আছে দু'জনেরই। দু'জনেই পত্র-পত্রিকার সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে জড়িত। অতএব তার আহ্বানকে অগ্রাহ্য করা গেলো না। শুরু করলাম আবার কার্টুন আঁকা।

বছরখানেক বিচিত্রায় তা করার পর একঘেয়ে মনে হতে লাগলো। ভাবলাম কার্টুন যখন করছিই তখন সিরিয়াসলিই করি এবং নতুন কিছু করা যায় কিনা তাও ভেবে দেখি।

কার্টুন করতে গিয়ে ছদ্মনাম 'রনবী'কে ব্যবহার করি। যদিও ব্যাপারটি আর ছদ্মাবরণে থাকেনি মোটেও। বরং নানা দিক দিয়ে আসল নামটিই যেন কিছুটা আড়ালে থেকেছে বেশ কিছুকাল। আমি তা উপভোগই করেছি, যেমন করেছি নামটি জানাজানি হওয়াটাও।

কার্টুনের জগৎটায় রনবী নামটি ষাট দশকের মাঝামাঝি থেকে ব্যবহৃত হলেও 'টোকাই' নামটির শুরু আরো পরে, সত্তর দশরের শেষ নাগাদের। মনে হয়, এইতো সেদিনের কথা...

এই সময় বহুকালের একটি পুষে রাখা ইচ্ছা ভাবনায় প্রায়শই উঁকি দিতে শুরু করলো। ইচ্ছাটি হলো- একটি স্ট্রিপ কার্টুন শুরু করার। কোনো একটি মোক্ষম চরিত্রকে মধ্যমণি করে জগৎ সংসারের কিছু রস-বিরসে মাখা কথাকে সেভাবে উপস্থিত করা। চরিত্রটির কোনো 'ভিজুয়েল' চোখের সামনে নেই, ভাবনাও ভাসে না তখনও। তবে

বিখ্যাত স্ট্রিপ চার্লি ব্রাউন, ডেনিস দা মিনাস বা ওই ধরনের চরিত্রের মতো কিছু করা যায় কিনা তা চিন্তায় আসতো।

এইখানে বলে নেয়া ভালো যে, কার্টুন চরিত্রের স্ট্রিপ না করলেও আমি এবং শাহাদত একত্রে একটি ইলাস্ট্রেটেড স্ট্রিপ চালিয়েছিলাম দীর্ঘকাল এবং তার থ্রিলার গল্পকে নিয়ে। শাহাদত গল্পটি লিখত আর আমি আঁকতাম। দীর্ঘকাল ধারাবাহিকভাবে চলেছিলো মহা উদ্দীপনায়। বেশ জনপ্রিয় হয়েছিলো স্ট্রিপটি।

কার্টুনটির জন্য 'টোকাই' নাম দিয়ে একটা চরিত্র সৃষ্টি করে বিচিত্রার বর্ষ শুরু সংখ্যায় যাত্রা আরম্ভ হয়। সেই থেকে চলছে। টোকাই শুরু করার সেই অভিজ্ঞতা বহুবার বহু পত্রিকায় বর্ণনা করেছি। তবুও অপরিহার্য বলে আবার উল্লেখ করছি সেই লেখারই অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে।

'টোকাই প্রথম দিকে শুরু করেছিলাম খাপছাড়া কতকগুলো চিন্তা নিয়ে। অর্থাৎ ছবি ও কথার (সংলাপ) মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য রেখে কার্টুনটিকে রসগ্রাহী করা যায়, কি পরিবেশে টোকাইকে রাখা যায়, টোকাই কি ধরনের কথা বলবে, চেহারাটি কেমন হবে, যে ছেলেটিকে নিয়ে টোকাই আঁকার চিন্তাটা মাথায় এসেছিল তারই হুবহু চেহারাটা আঁকা উচিত হবে কিনা- এসব নিয়ে নির্ধারিত কোনো পরিকল্পনা না থাকায় এবং এ ধরনের কার্টুন সিরিজ করার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় প্রথম দিকে বিস্তর গরমিল নিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে অসুবিধের ছিল চেহারার ড্রইং বের করাটাই।'

এটা ছিলো শুরুর দিকের সমস্যা নিয়ে কথা। শুরু করার পর কয়েক সংখ্যার মধ্যেই হঠাৎ অসংখ্য প্রশংসার চিঠি এসে হাজির। সেই সঙ্গে কিছু কিছু পরামর্শও পাঠকদের। প্রশংসিত হয়ে কাজটির প্রতি মনোযোগ বেড়ে গেলো স্বাভাবিকভাবেই। তারপর তো শুধুই এগিয়ে যাওয়া। পাঠকদের কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একটিবারের জন্যেও বিচিত্রার পাতা থেকে অনুপস্থিত থাকা যায়নি। আর তার একটিই কারণ যে তখনই পাঠকদের সঙ্গে, সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে টোকাইয়ের সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়, স্নেহের, আদরের ভালোবাসার। যেন সত্যিকারের একজন। ধীরে ধীরে আসলো ঘরহীন, পরিবারহীন, ছিন্নমূল পথশিশুরাও ওই টোকাইয়ের মতো স্নেহের পাত্র হয়ে ওঠে সবার কাছে। কার্টুনের জন্য খ্যাতি পাওয়া প্রতিষ্ঠিত আমার রনবী নামটির চাইতে টোকাই খ্যাতিমান বেশি। রীতিমতো বহুল আলোচিত একটি চরিত্র।

একটা সময় আসলো যখন আমি নিজে পৌরাণিক গল্প বরপ্রাপ্ত রাজা 'মাইডাস'-এর স্থানে নিজেকে ভাবা শুরু করলাম। ব্যাপারটি

নির্বাচিত টোকাই

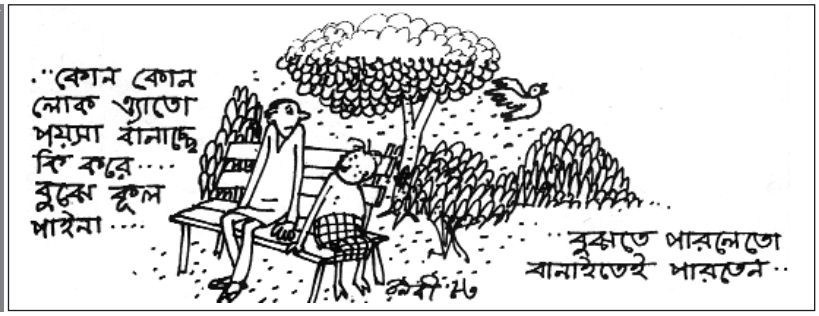

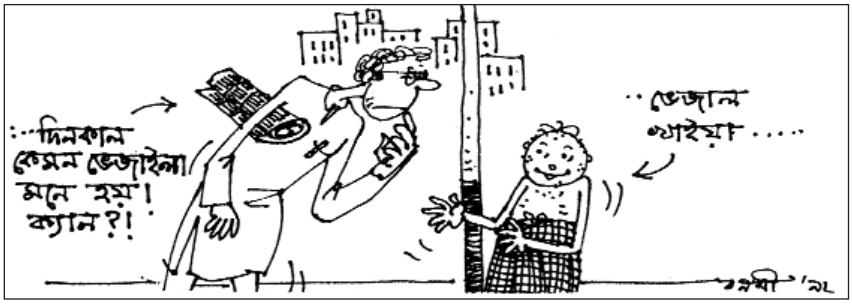

ভক্তদের দ্বারাই তৈরি বলা বাহুল্য। তাদের ধারণা, আমি যা কিছুতে হাত দেবো- সোনা হয়ে যাবে। রনবী নামটিতে 'পয়া' ভর করা, 'কুফা' নয়। এসব শুনে কার না ভালো লাগে। আমি নিজেই বুঝতে পারছিলাম টোকাইদের সাফল্যটা আশাতীত হয়েছে। ঘটনাগুলো মজার তাই উল্লেখ করছি। পয়া-অপয়া নিয়ে এইসব ভাবার কারণ আছে। টোকাইয়ের জনপ্রিয়তা দেখে সে সময় আলাউদ্দিন মিষ্টির বিজ্ঞাপনের অনুরোধ আসলো। বলা হলো কার্টুন দিয়ে কিছু করলে তা জনপ্রিয় হবে। আমি করলাম এবং সত্যি সত্যিই সেই মিষ্টি শিল্প প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞাপন দারুণ জনপ্রিয় হলো। সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসার কলেবরও।

মধ্য আশির দশকে শ্রদ্ধেয় শফিক রেহমান একদিন এসে অনুরোধ করলেন তার নতুন প্রকাশিতব্য 'যায়যায়দিন' পত্রিকার উদ্বোধনী সংখ্যার প্রচ্ছদ কার্টুনটি যেন আমি করে দিই। বলেছিলেন, আপনার 'পয়া' হাতের কাজটি দিলে পত্রিকাটির শুভযাত্রা হবে। আমি করে দিয়েছিলাম। এবং সত্যি সত্যিই তার পত্রিকাটি জনপ্রিয় হয়েছিল সেই সংখ্যা থেকেই।

এসব নিয়ে ভাবতে গিয়ে আবিষ্কার করেছিলাম যে আসলে আমি বা আমার রনবী নামটি নয়, সব কিছুর মূলে ছিলো 'টোকাই'। একটা কথা ঠিক যে, টোকাই আমাকে অনেক কিছু ভাবতে শিখিয়েছে। সমাজ সংসারের সব ধরনের খুঁটিনাটির প্রতি আমাতে বাধ্য করেছে। যে চোখ ছিল শুধুই শিল্পীর তা হয়ে গেল সমালোচকের। এক সময় দক্ষ দক্ষ ভাবও এসে গেল সব কিছু অন্য চোখে দেখে, গ্রহণ করে টোকাইতে উপস্থিত করার।

এই দেখার চর্চা শুধু দেশেই সীমাবদ্ধ রইলো না। বিশ্বের আর সব দেশেও যে আমাদের মতই পথশিশু রয়েছে, তারাও যে নিজ নিজ দেশের আর্থ-সামাজিক দুরবস্থার শিকার, সেসব জানার, দেখার সুযোগ হয়েছে টোকাই আঁকার কারণে। ক'বছর আগে মেক্সিকোতে শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে একটি বড়সড় 'ট্রাইবুনাল' বসেছিলো। বিশ্বের বড় ছোট ধনী গরিব সব দেশের শিশু বিষয়ক, শ্রম বিষয়ক। ভাবনা-চিন্তার অধিকারী এবং এসব সংক্রান্ত আইনজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন সেখানে শিশুদের যারা শ্রমিক হতে বাধ্য করে তাদের শাস্তি দাবি করতে। আমিও সেখানে সাতজন সম্মানিত বিচারকের একজন হতে পেরেছিলাম। তাতে যোগ দিয়ে জানতে পেরেছিলাম কী ভয়াবহ আর করুণ অবস্থায় দিন যাপন করে সারা বিশ্বের কোটি কোটি শিশু। এমনিভাবে ইউনিসেফ থেকে ডাক পড়েছিলো বিশ্বময় শিশুদের যে অপুষ্টি আর মারণ ব্যাধিতে মৃত্যুহার বাড়ে তা থেকে কি করে তাদেরকে বাঁচান যায়, সেই রকমের

শাহাদত চৌধুরী বাল্যবন্ধু। ঘনিষ্ঠতম। চারদিক দেখতে দেখতে আমাদের একসঙ্গে বেড়ে ওঠা। দু'জনেই দু'জনের জীবনী লেখার মতো সারা জীবনের 'ঘাট ঘাপলা'গুলিকে জানি। পরস্পরের উঠতি-পড়তিকে প্রত্যক্ষ করা আছে দু'জনেরই। দু'জনেই পত্র-পত্রিকার সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে জড়িত। অতএব তার আহ্বানকে অগ্রাহ্য করা গেলো না। শুরু করলাম আবার কার্টুন আঁকা..

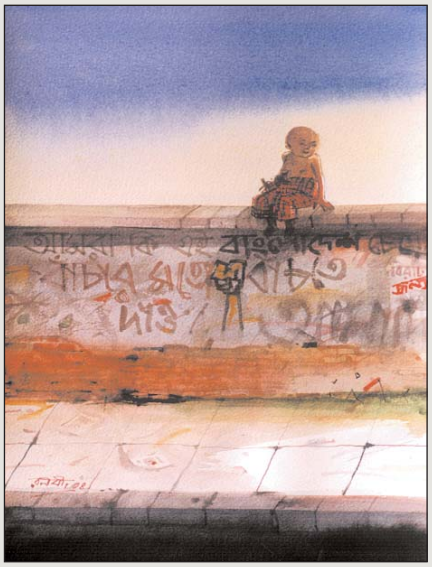

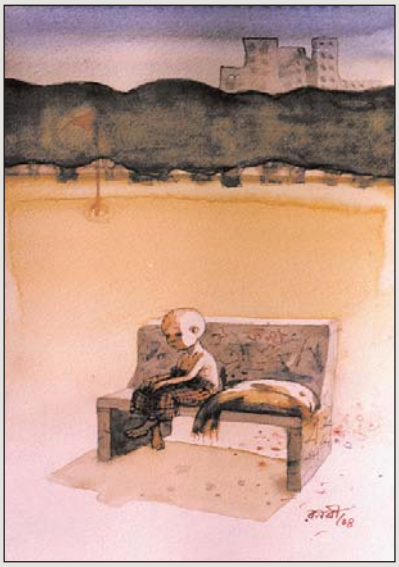

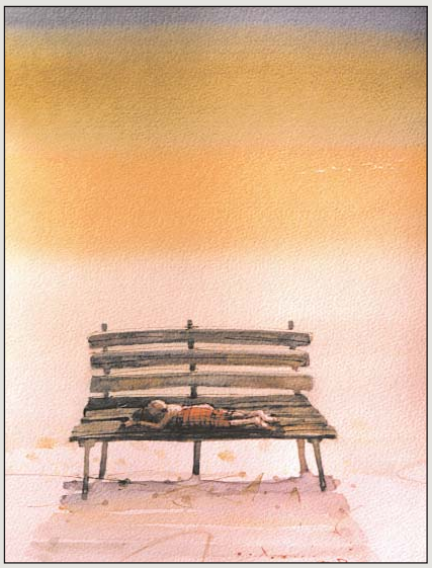

টোকাই প্রদর্শনী

টোকাইয়ের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ২৮ মে, ২০০৪ বিকাল ৬টায় টোকাই ভিত্তিক রনবীর একক চিত্র প্রদর্শনী শুরু হচ্ছে। প্রদর্শনী উপলক্ষে ৭০টি টোকাই ভিত্তিক জলরঙ ছবি এঁকেছেন শিল্পী। এছাড়াও থাকবে ১০০টি নির্বাচিত টোকাই কার্টুন।

প্রদর্শনী চলবে ১৫ জুন ২০০৪ পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা।

প্রধান অতিথি : **অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম**

বিশেষ অতিথি : **শিল্পী হাশেম খান**
শাহাদত চৌধুরী, সম্পাদক, সাপ্তাহিক ২০০০

সভাপতি : **শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী**

স্থান : গ্যালারী চিত্রক
রোড- ৪, বাড়ি- ২১, ধানমন্ডি, ঢাকা।

আন্তর্জাতিক কর্মশালায়। এরকম সব কর্মকান্ডে গিয়ে একদিকে যেমন শুধু শিল্পীর চোখে জগৎ দেখা ছাড়াও যে বাস্তবকে দেখার অন্য একটা জাগতিক চোখও থাকতে হয়, প্রয়োজন হয় অন্যভাবে অনুভব করার তা জানতে পেরেছি। এবং এসবই টোকাইয়ের কারণে। অতএব বলতে কি, টোকাই আমার জীবনের অন্য রকম অভিজ্ঞতা।

তবে নিরানব্বইতে সেঞ্চুরি ছুটে গেলে ব্যাটসম্যানের যে দশা হয়, প্রায় তেমনটা হয়েছে টোকাইয়ের। আউট হয়ে যায়নি কিন্তু ইনজুরিতে মাঠ ছাড়তে হয়েছে। একনাগাড়ে সময়ের এতটা পথ পেরিয়ে আসলেও ঠিক পঁচিশ বছর পূর্তির বা রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপন করা যায় এমন পর্যায়ে পৌঁছবার কাছাকাছিতে এসে হঠাৎ অনিয়মে পড়ে গেল। অতএব নিয়মিত প্রকাশিত হবার নিয়মটায় ভাঙন ধরল। অবশ্য একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি, বিভিন্ন পত্রিকায় ছুটছাট মুদ্রিত হয়েছে বলে রক্ষে।

এদিকে টোকাইয়ের আত্মপ্রকাশ এবং নামকরণের বয়স পঁচিশ পেরিয়েছে আগেই। বছর কয়েক আগে থেকেই বিভিন্ন শুভানুধ্যায়ীর পরামর্শ আসছিলো খুব ঘটা করে ২৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করার। বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধাররাও এ নিয়ে দারুণ উৎসাহ দেখিয়েছেন। অনেকে বলেছেন, 'টোকাই আমাদের জাতীয় বিবেক, অভাবনীয় একটি কাজ, সবারই এ ব্যাপারে কিছু করা উচিত ইত্যাদি ইত্যাদি। তাদের

কার্টুন চরিত্রের স্ট্রিপ না করলেও আমি এবং শাহাদত একত্রে একটি ইলাস্ট্রেটেড স্ট্রিপ চালিয়েছিলাম দীর্ঘকাল এবং তার থ্রিলার গল্পকে নিয়ে। শাহাদত গল্পটি লিখত আর আমি আঁকতাম।...
কার্টুনটির জন্য 'টোকাই' নাম দিয়ে একটা চরিত্র সৃষ্টি করে বিচিত্রার বর্ষ শুরু সংখ্যায় যাত্রা আরম্ভ হয়। সেই থেকে চলছে। টোকাই শুরু করার সেই অভিজ্ঞতা বহুবার বহু পত্রিকায় বর্ণনা করেছি। তবুও অপরিহার্য বলে আবার উল্লেখ করছি সেই লেখারই অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে...

ভালোবাসা দেখে সত্যি সত্যিই ভাবতে শুরু করলাম পঁচিশ বছর পূর্তির আয়োজন নিয়ে। ঠিক হলো, একটি প্রদর্শনী করার। শিল্পীর পক্ষে এটাই একমাত্র হাতের মুঠোয় থাকার উপায়। কিন্তু যেই না তাঁদের কাছে খরচ বহনের কথা উঠলো সঙ্গে সঙ্গে টোকাইয়ের বিপরীতের মানুষ হয়ে গেলেন সবাই

টোকাই আঁকার শুরুর দিকে- অর্থাৎ সত্তর দশকের শেষ প্রান্তেও অনেক ক্ষেত্রে ছাপাখানার কাছে সারেন্ডার করে কাজ করতে হতো শিল্পীদের। আর বিচিত্রার ব্যাপারটি ছিলো আরো এককাঠি বাড়া। অনেক কাজ শেষ মুহূর্তে গলদঘর্ম হয়ে করার ব্যাপারটি সবার গা সওয়া ছিলো। আমিও তা থেকে রেহাই পেতাম না। অতএব, বেশির ভাগ কাজই পেস্টিংয়ের দিন অর্থাৎ প্রতি মঙ্গলবার সরাসরি ট্রেসিংয়ে ড্রইং করে ক্যাপশান লিখে টোকাই এবং অন্যান্য আঁকাজোকা সারতে হতো...

অবলীলায়। তো, প্রস্তুতি নিতে গিয়ে দেখি প্রদর্শনীর আসল রসদই নেই। অর্থাৎ এ যাবৎ যত টোকাই আঁকা হয়েছে তার 'অরিজিন্যাল' ড্রইংগুলোতো নেইই- ছাপানোগুলোও প্রদর্শনী করার সমান নেই। তাছাড়া সাপ্তাহিক বিচিত্রার যেসব পুরনো সংখ্যা এদিক-সেদিক থেকে যোগাড় করা গেছে, সেসবের কাগজ এবং ছাপার যে দুর্দশা তা আর প্রদর্শনযোগ্য নেই। কাগজগুলো যে এক সময় সাদা ছিলো, তা যেমন বোঝার উপায় নেই তেমনি ড্রইংগুলো যে আমারই তাও কাউকে বিশ্বাস করানোর পর্যায়ে নেই। সময়ের ভারে যেসব এমন ক্ষত-বিক্ষত হওয়া যে, সবটার উদ্ধারই সম্ভব নয়।

অবশ্য নষ্ট হবার জন্য শুধু সময়কে দোষ দেয়া বোধহয় উচিত হবে না। টোকাই আঁকার শুরুর দিকে- অর্থাৎ সত্তর দশকের শেষ প্রান্তেও অনেক ক্ষেত্রে ছাপাখানার কাছে সারেন্ডার করে কাজ করতে হতো শিল্পীদের। আর বিচিত্রার ব্যাপারটি ছিলো আরো এককাঠি বাড়া। অনেক কাজ শেষ মুহূর্তে গলদঘর্ম হয়ে করার ব্যাপারটি সবার গা সওয়া ছিলো। আমিও তা থেকে রেহাই পেতাম না। অতএব, বেশির ভাগ কাজই পেস্টিংয়ের দিন অর্থাৎ প্রতি মঙ্গলবার সরাসরি ট্রেসিংয়ে ড্রইং করে ক্যাপশান লিখে টোকাই এবং অন্যান্য আঁকাজোকা সারতে হতো। সেসব দারুণ অভিজ্ঞতা। ক্রোকুইল্ট নিব আর 'চাইনিজ ইঙ্ক' ছিলো সহায়। সেসব দিয়ে আঁকা ড্রয়িংয়ের কাঁপাকাঁপা অবস্থা যে কি নিদারুণ চেহারায় দাঁড়াতো- এমনিতেই কার্টুনধর্মী হয়ে যেতো বলে নিজেরাই না হেসে পারতাম না। আঁকা এবং ছাপা দুই-ই বেকায়দার ছিলো। নিজের পুনঃবিচারেরও সুযোগ থাকতো না। কী দিনকালই না গেছে! প্রযুক্তি আর কর্মকে সাফল্যের সঙ্গে যুক্ত করে একাট্টায় দেখার কথা প্রায় ভাবাই যেতো না।

যাই হোক, ড্রইংয়ের অরিজিন্যালগুলোও জমা করা হয়নি কোনোদিন। পত্রিকা অফিস থেকে কখনোই সেসব ফেরত পাওয়া যায়নি। এটা পত্র-পত্রিকার মানুষদের চিরদিনেরই স্বভাব বটে। একটা বেরিয়ে গেলেই 'খেল খতম পয়সা হজম' অবস্থা। যা হবার হয়েছে, ওটিকে নিয়ে আর ভাবার কারো সময় হয় না। কারণ তখন পরের সংখ্যাটিকে নিয়ে ভাবার গলদঘর্ম সময় এসে উপস্থিত হয়।

তো সেই হুড়েপাড়ে অরিজিন্যাল ড্রইংগুলো ফেরত পাবার ব্যাপারে যেমন 'এই দেবো দিচ্ছি'- কথাটা চালু থাকতো তেমনি আমাকেও 'নেবো নিচ্ছি'তে ভর করে থাকতো, নেয়া আর হয়ে উঠতো না। তবে ভরসা ছিলো যে, বিচিত্রার সংখ্যাগুলো তো জমানো আছেই। এসব থেকেই নেয়া যাবে। কিন্তু সেসবের আবার অন্য ঘটনা। বেশ ক'বছর আগে গ্রন্থকারে টোকাই ছাপতে গিয়ে দেখি সেসব জমানো বিচিত্রা প্রায় নেই বললেই চলে। যা আছে তা ক্ষত-বিক্ষত। চার ভাগের দুই ভাগ বইপত্র খেঁকো আঁতেল পোকার পেটে গেছে ভূরিভোজ হয়ে, এক ভাগ নেংটি ইঁদুরের পোলাও-মাংস হয়ে সাবাড় এবং আর এক ভাগ এক কটকটি লোভী টোকাইয়ের কারণে গায়েব। মাঝে এক সময় বাসায় এক পিচ্চি ছিলো তার মায়ের সুবাদে। সারাদিন গড়িয়ে পড়িয়ে তার দিন গুজরান হতো। তার জীবনের শ্রেষ্ঠ লোভ ছিল পুরনো কাগজ, লোহা-লক্কড় আর শিশি-বোতলের বিনিময়ে কটকটি খাওয়া। কাগজওয়ালাদের সঙ্গে ছিলো তার অগাধ হৃদ্যতা। অবশেষে যে অংশটি গিন্নির বদৌলতে বেঁচে গিয়েছিলো সেইগুলো নিয়ে বই হতে পেরেছিলো।

পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে যে প্রদর্শনী হতে যাচ্ছে, তাও অতএব সেই বেঁচে যাওয়া কিছু কার্টুনের 'রি ড্রইং' নিয়ে। বলা বাহুল্য যে, ইচ্ছে ছিলো শুধুই কার্টুন নিয়ে প্রদর্শনীর। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে মনের সায় মিলল না। কেবলই মনে হতে লাগলো টোকাইকে নিয়েই ভিন্নতর কিছু করা উচিত। সেই অনুযায়ী মনে মনে যা স্থির করলাম তা প্রায় মাঝ সমুদ্রে ভেলায় চেপে অচেনা ডাঙা খোঁজার শামিল। ব্যাপারটি এরকমের যে নিজের ছবি রচনার আঙ্গিকে কার্টুন চরিত্র টোকাইকে মিশিয়ে কিছু করার। অজানা একটি জগৎ তৈরির ভাবনা। ফলাফল কি দাঁড়াবে তাও জানা নেই।

আসলে ইচ্ছাটি পরীক্ষাধর্মিতার। কার্টুন+ছবি একত্রে মিলমিশ ঘটিয়ে কিছু করার চেষ্টা। ছবির নান্দনিকতা, আবহে জাগতিক বাস্তবতা, উপস্থাপনায় ফ্যান্টাসি, প্রকাশে ব্যঙ্গ, বিষয়ে কার্টুন চরিত্র টোকাই। একঘাটে এতোসবকে জড়ো করে চিত্র ভাষায় রূপান্তরের চেষ্টা শেষে এই করলাম এবং প্রদর্শনীও তাই দিয়েই সাজানো হচ্ছে। মোট কথা একটা ভিন্ন মাত্রা দেয়ার চেষ্টা। ছবি-ছবি কার্টুনে বা বলা যায় কার্টুন-কার্টুন ছবিতে। দর্শকরা, শুভানুধ্যায়ীরা যে যা ভাবেন, যে যেমনটাকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেন।

নির্বাচিত টোকাই

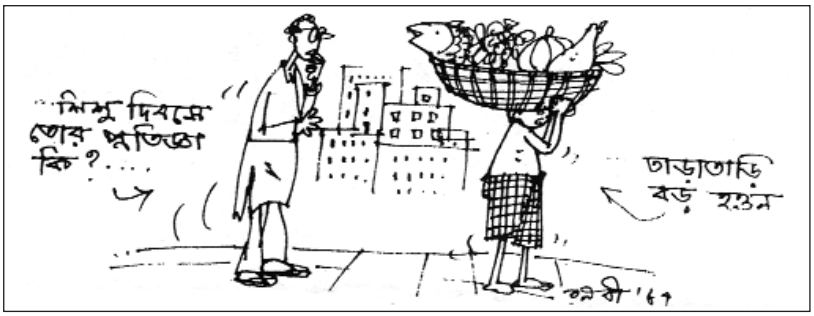

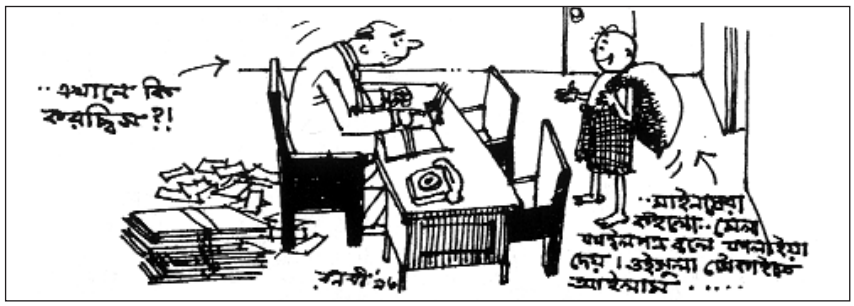

তো, টোকাই আঁকা এবং নামকরণের পঁচিশ বছর পূর্তি প্রদর্শনী দিয়েই উদ্‌যাপিত হচ্ছে। আর্থিক টানাপড়েনে শিল্পী হিসেবে এছাড়া অন্য আর কি বা ভাবা যেতো। এই পঁচিশটি বছরকে নিয়ে ভাবতে গিয়ে অবাকই হলাম। কী সুদীর্ঘ পথ হাঁটা হয়ে গেলো টোকাইয়ের সঙ্গে। দেশকাল এবং নিজের নানান উঠতি পড়তির মধ্য দিয়ে পেরিয়ে এলাম দীর্ঘ সময়। এখন পিছন ফিরে তাকালে অবাকই হই ভেবে যে অজান্তে জীবনে একটি বড় কাজই করে ফেলেছি বোধহয়। অর্ধেক উদ্দীপনা আর অর্ধেক অর্থাভাবকে সঙ্গী করে যে কাজ শুরু করেছিলাম তার ফলাফলের একটা দিক নিয়ে আমি গর্ববোধ করি যে, আমার কাগুজে চরিত্র টোকাই প্রতীকটির কারণে দেশের মানুষ আসল পথশিশুদের সম্বন্ধে অনেক অনেক সজাগ হয়েছে। তাদের প্রতি ভালোবাসায়, স্নেহের, এমনকি তাদের জীবন গড়ার দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছে অনেকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে, ব্যক্তিগতভাবেও।

সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই এখন এই অবক্ষয় চলছে। আর এই দুর্দিনে চারিত্রিকভাবে মানুষ উপরে ওঠার চাইতে নিচের দিকেই নেমে যাচ্ছে ক্রমশ। সবদিকেই অনিশ্চয়তা আর সর্বনাশের বিশাল অন্ধকার গহ্বর যেন অপেক্ষমাণ। আমরা দ্রুত সেদিকে ছুটে নামছি। এবং পরবর্তী এবং তার পরের প্রজন্মগুলোর শিশু যারা পরবর্তীতে নাগরিকের ভূমিকা নেবে তাদেরকে এখনই সেই দুর্যোগ থেকে বাঁচাবার পন্থা বের করতে হবে, এই মুহূর্তেই। তা না হলে এই কয়েক কোটি শিশুর অভিশাপ লাগবে এখনকার সবারই। তেমন কিছু ভালো দিক উন্মোচিত হলে ভবিষ্যতে সব শিশু সমান মর্যাদার হবে। টোকাই বলে কেউই তখন থাকবে না। আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক- 'আমরা কাউকে চরিত্র ভ্রষ্ট হতে দেব না।'

'আমার টোকাই সমগ্র দরিদ্র শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে'

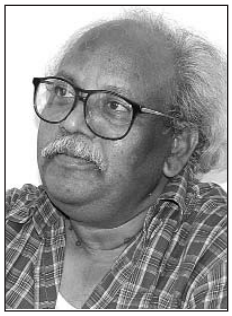

রফিকুন নবী

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **সাইফুল হাসান**

সাপ্তাহিক ২০০০ : ২৫ বছর আগে যে টোকাইকে দিয়ে শুরু করেছিলেন, সেই টোকাই আর বর্তমান টোকাইয়ের মধ্যে অবস্থানগত পার্থক্য কতটুকু?

রফিকুন নবী : টোকাইয়ের বইগুলো ঘাঁটছিলাম এতক্ষণ। এ বিষয়ে আমিও ভেবেছি। ব্যাপারটা আসলে ২৫ বছরের নয়। যে অবস্থা দেখে শুরু করেছিলাম ২৫ বছর আগে, তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। ২৫ বছর আগেও যে অবস্থা ছিল এখনও তা আছে। ঢাকায় বড় বড় বিল্ডিং উঠছে, শপিং মল হচ্ছে, নানা কিছু ঢাকাকে বদলে দিচ্ছে। কিন্তু টোকাইয়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। ঠিক তেমনি আমার আঁকার ক্ষেত্রেও তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। ২৫ বছর আগের মতোই একই সমস্যা নিয়ে আছি।

২০০০ : টোকাইয়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাখ্যা কি?

রনবী : দেখেন আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাখ্যা একেক ক্ষেত্রে একেক রকম। আমার চেয়ে উচ্চবিত্তের যারা তাদের কাছে আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাখ্যা এক রকম। আমার কাছে অন্যরকম। আর্থ-সামাজিক অবস্থা বলতে দিনকাল চালানোর সামর্থ্যের কথা বলছি। টোকাই একটা বিশাল জনগোষ্ঠী। তাদের ভূত-ভবিষ্যৎ নাই, পরিবার নাই, টোকাইরা কিভাবে বড় হয় আমরা জানি না। আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নাই। কিন্তু দেশ হিসেবে আমরা বিদেশে এসব গরিব মানুষদের দেখিয়ে পয়সা নিয়ে আসি। আমি আসলে বলতে চাইছি বিরাট গরিব জনগোষ্ঠীর জন্য গত ২৫ বছরে আমরা কোনো পরিবর্তন আনতে পারিনি।

২০০০ : ২৫ বছর ধরে আপনার টোকাই শিশু। তো টোকাই কখনো বড় হবে না?

রনবী : টোকাই একটি প্রতীক চরিত্র। টোকাইকে একটা ফ্যান্টাসির মধ্যে রেখে উপস্থাপন করি। যদি চরিত্রগুলো ধ্বংস হয়ে যেতো তাহলে হয়তো এ বিষয়ক একটা ভাবনা থাকতো। চোখ বন্ধ করলেই আমি ৫২, ৬২, ৬৯ মিছিলের সামনে ছোট ছোট বাচ্চাগুলো দেখতে পাই। আজও মিছিলের সামনে সেই একই মুখগুলো। অতএব ওদের তো বয়স নেই। বয়স তো ব্যক্তিক। কিন্তু টোকাইরা সামষ্টিক। ওদের বয়স বাড়ে না, টোকাই বড় হয় না।

২০০০ : ২৫ বছর ধরে আপনি টোকাই আঁকছেন। তো টোকাইকে কি আপনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন? তাদের চরিত্র পর্যবেক্ষণ করেছেন না বার্ডস আইয়ের মতো ওপর থেকে সমগ্র টোকাইকে একটা ফ্রেমের মধ্য থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন?

রনবী : হ্যাঁ বার্ডস আইয়ের মতো ভাসাভাসা দেখি। এটা বলাই শ্রেয়। কারণ আমরা তো ভেতরের মানুষ না। একজন সমাজবিজ্ঞানী হয়তো কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ

নির্বাচিত টোকাই

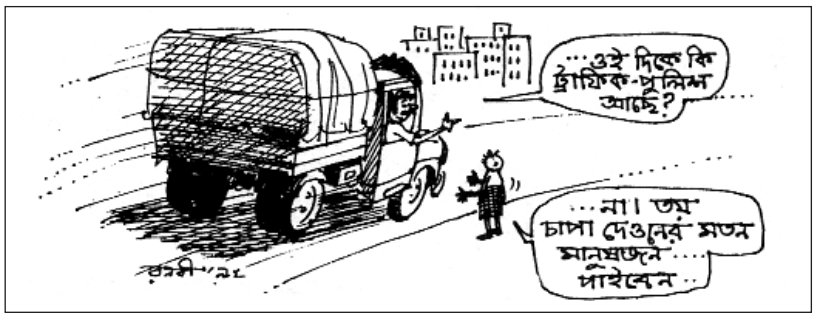

করবে একটা চরিত্রকে। টোকাইকে আমি বাইরে থেকে দেখি কিন্তু ভেতরের উপলব্ধিটা বের করে আনার চেষ্টা করি। এই ভাসাভাসা দেখার ভেতরেও শিল্পীর আলাদা একটা দৃষ্টি থাকে। যাতে অন্তর্গত মূল্যায়নটা হয়। মূল্যায়নটা সঠিক হয় বলেই টোকাইকে মানুষ আপন করে নিয়েছে। টোকাইয়ের প্রতি ভালোবাসা এই কারণেই জন্মেছে। টোকাইকে আমি যেভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছি, মানুষও তাদের মতো সেইভাবে ভাবতে শিখেছে।

২০০০ : যাদের জন্য আপনার দীর্ঘদিনের নিরলস প্রচেষ্টা। তারা কি জানে বা জানাতে পেরেছেন তাদের জন্য আপনি পরিশ্রম করে যাচ্ছেন...

রনবী : প্রথমে ওরা বুঝতো না। কারণ ওদের সলিম, কলিম ইত্যাদি নাম থাকে। তো ওদের কেউ টোকাই বললে প্রথম দিকে ওরা রিঅ্যাক্ট করতো। পরে ওরা দেখেছে টোকাই নামটা একটা আকর্ষণীয় ও আদরণীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া আমি টোকাই আঁকি টোকাইদের জানানোর জন্য নয়। বরং সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার যেন ওদের ব্যাপারে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে সেটাই ছিল আমার লক্ষ্য। বেঁচে থাকাটাই যেখানে বড় অনিশ্চয়তা সেখানে টোকাইদের আমার টোকাইয়ের কথা জানার সুযোগ কোথায়?

২০০০ : দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ দরিদ্র। টোকাইয়ের মতো তাদের জীবনও বড় অনিশ্চিত। টোকাই আর দরিদ্র মানুষের মধ্যে পার্থক্য কি?

রনবী : টোকাইকে আসলে দারিদ্র্যের সঙ্গে আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই। যখন বিদেশে গিয়ে নিজেদের দারিদ্র্য বেচে সাহায্য নিয়ে আসি তখন তো আমরাই টোকাই। তাই না? ব্যাপারটাকে এভাবে দেখলে সুবিধা। যারা রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান কিংবা অর্থনীতি নিয়ে কাজ করেন তারা টোকাইয়ের সঙ্গে দরিদ্রের পার্থক্য খুঁজবেন। আমার টোকাই পাইপের মধ্যে থাকে। যখন যে অবস্থায় সে থাকে, তখন সেই অবস্থায়ই সে মানানসই। আমার টোকাই সমগ্র দরিদ্র শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে।

২০০০ : ২৫ বছর টোকাইয়ের সঙ্গে আপনার বসবাস। আপনি কী অনুভব করেন?

রনবী : উত্তরটা বেশ কঠিন। ২৫ বছর দীর্ঘ সময়। তারপরও অনেক অনেক ভাবতে হয়। যেমন এই সপ্তাহের টোকাই কি যাবে, এর জন্য বিগত সপ্তাহের সবগুলো বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হয়। কাজটা বেশ কঠিন। তো সাধারণ মানুষ যেসব সমস্যা নিয়ে ভাবে, আমি সেই সব সমস্যা নিয়ে টোকাই করার চেষ্টা করি। তাতে সাধারণ মানুষ ভাবে রনবী তার সমস্যা নিয়ে কথা বলছে। টোকাই পিচ্চি কিন্তু পাণ্ডিত্য নিয়ে কথা বলে। অনেক সময় ছেলেমানুষী করে কিন্তু শিশুসুলভ ওই সব কথায়ও অনেক মেসেজ থাকে। টোকাইরা কিন্তু এমনিতেই বুদ্ধিদীপ্ত। কারণ যেভাবে টিকে থাকতে হয় তাতে বুদ্ধিমান না হয়ে কোনো উপায়ও ওদের সামনে থাকে না। টোকাইয়ের ব্যাপারগুলো হয়তো সাধারণ কিন্তু সপ্তাহজুড়ে আমাকে ভাবতে হয়। আমাদের দেশে সহনশীলতার অভাব। ফলে ভেবেচিন্তে টোকাইকে এমন একটা কথা বলতে হয় যেন অকারণ কোনো প্রতিক্রিয়া না হয়। এই কথাগুলো বলার কৌশল আমাকে শিখতে হয়েছে। হ্যাঁ, ২৫ বছর অনেক সময়। কিন্তু মনে হয় এই তো সেদিন শুরু করলাম। বিচিত্রায় প্রথম যখন শুরু করলাম, মানুষ টোকাইকে গ্রহণ করলো। তখন ভেতরে একটা উদ্দীপনা তৈরি হলো। ২৫ বছরের চর্চায় টোকাইদের সম্পর্কে একটা সচেতনতা এসেছে। আবার এটাও ঠিক, একটা জিনিস নিয়ে দিনের পর দিন ভাবতে ভাবতে, ভাবনার একটা ক্লান্তিও আছে।

২০০০ : টোকাইয়ের চোখে গত ২৫ বছরে কি পরিবর্তন দেখছেন?

নির্বাচিত টোকাই

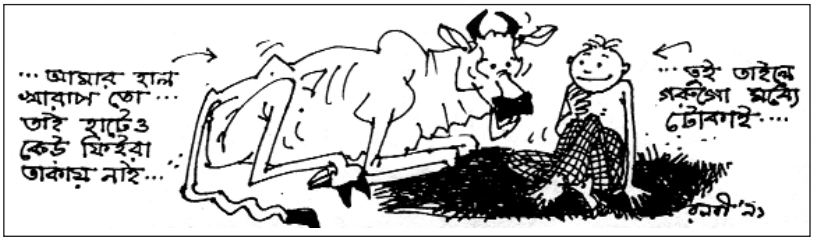

পরিণতি হলো, আমি না থাকলে টোকাই নাই। সেটা নাই তো নাই। সামগ্রিক অর্থে সামাজিক টোকাই আছে, থাকবে। সামাজিক নিয়মকানুনের মধ্য থেকে ওদের আমরা তুলে আনতে পারবো না। এটা আমার ব্যক্তিগত ধারণা। তবে ভবিষ্যতে ভালো মানুষেরা যদি সমাজ-সংসারের দায়িত্বে আসে তবে একটি পরিবর্তন আসতেও পারে...

রনবী : একই চাওয়া-পাওয়া, একই রাজনীতি। এই যে অভ্যাস এতে কেউ বড়লোক, কেউ গরিব হবে। রাজনৈতিকভাবে একজন আরেকজনকে অপদস্ত করবে এটাই তো দেখে আসছি। একটা পরিবর্তন দেখছি। আগে কিডন্যাপে, হাইজ্যাকে বা অন্য যেকোনো সাধারণ ক্রাইমে চাকু দিয়েই চলতো। এখানে এখন অত্যাধুনিক অস্ত্র এসেছে। এ রকম একটা টোকাই করেছিলাম মনে পড়ছে। একজন বিভিন্ন অস্ত্র থেকে পরিত্রাণ পাবার পথ খুঁজছে। টোকাই উত্তর দিচ্ছে এর যেকোনো একটাই মরে যাওয়া হলো পরিত্রাণের সহজ উপায়। টোকাই নিয়ে কাজ করতে করতে দেখছি উগ্রতা বেড়েছে, সহনশীলতার মাত্রা শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক দিক থেকে আমরা যত শিক্ষিত হই না কেন, আমার মনে হয় এখান থেকে মুক্তি পেতে অনেক সময় লাগবে। আমরা একটা অসভ্য সময়ের মধ্যে আছি।

২০০০ : টোকাইয়ের পরিণতি কি?

রনবী : পরিণতি হলো, আমি না থাকলে

টোকাই নাই। সেটা নাই তো নাই। সামগ্রিক অর্থে সামাজিক টোকাই আছে, থাকবে। সামাজিক নিয়মকানুনের মধ্য থেকে ওদের আমরা তুলে আনতে পারবো না। এটা আমার ব্যক্তিগত ধারণা। তবে ভবিষ্যতে ভালো মানুষেরা যদি সমাজ-সংসারের দায়িত্বে আসে তবে একটি পরিবর্তন আসতেও পারে। ধনী দেশেও কিন্তু টোকাই আছে। বিলেতে আমি টোকাই দেখেছি। ভেবেছি আহারে, কত বড়লোক দেশ তাদের দেশে কেন টোকাই থাকবে! তার মানে হলো সমাজের মাঝে কোথাও বড় একটা গোলমাল আছে। এটা শুনেই অনেকে বলে আমি কমিউনিজমের কথা বলছি। কমিউনিস্টদের নীতি প্রতিষ্ঠা করতেই তো সময় গেলো। যা হোক, একটা গোলমাল যেহেতু আছে যেহেতু একটা ওয়েআউটও আছে বলে আমার মনে হয়।

২০০০ : আপনার জানা মতে দেশের বাইরে কেউ আপনার মতো এসব পথশিশুদের নিয়ে কি কাজ করে?

রনবী : অন্য দেশে কেউ কোনো কাজ করছে কি না জানি না। বিদেশের টোকাই বিদেশের মতো আছে। আমাদের টোকাইদের অবস্থা খুব খারাপ। এখান থেকে বের হবার কোনো উপায় দেখি না।

২০০০ : টোকাইকে আমরা সাধারণ বলতে পারি না, কারণ সে বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা বলে। তো টোকাইকে কি আপনি সমাজের বিবেক হিসেবে তুলে আনতে চেয়েছেন?

রনবী : আমি যে ছেলেটিকে দেখে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম সে ছিল অসম্ভব বুদ্ধিদীপ্ত। তার সঙ্গে কথা বলে কেউ জিতে যাবে তা হতে দিতো না। যা হোক, টোকাইয়ের প্রশ্ন এবং উত্তর আমি তৈরি করছি। আবার সেটাকে চরিত্রের সঙ্গে মিলাচ্ছি। মূল ব্যাপার হচ্ছে, ক্যারেক্টারকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা। যে কারণে টোকাইকে বলছি পন্ডিত আবার বালক, ইঁচড়েপাকা আবার সুইট। টোকাই আমার চেয়ে পন্ডিত এবং জনপ্রিয়। টোকাই পুরো সমাজকে প্রতিনিধিত্ব করে না কিন্তু দেখে এবং খোঁচা দেয়। তার অনেক ফ্যান্টাসি আছে। সে মশা, ছাগল, বড়লোকদের সঙ্গে কথা বলে। টোকাইয়ের খোঁচাগুলো অনেক অর্থ বহন করে। টোকাই অনেক কৌতূহলী। মূল ব্যাপার হলো, এটাকে শৈল্পিকভাবে উপস্থাপন করা। বিচিত্রা যদি টোকাইকে ভালোভাবে প্রজেক্ট না করতো তাহলে আমি হয়তো চরিত্র বদলাতাম। সুখন নামে একটা ক্যারেক্টার শুরু করেছিলাম কিন্তু পরে সেটা বদলাই।

একটি প্রস্তাবনা

'টোকাই' তিন অক্ষরের এই শব্দটি বোঝায় অনেক কিছু। স্থান করে নিয়েছে বাংলা অভিধানে। টোকাই আমাদের সমাজ ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি, নির্মম বাস্তবতা। টোকাই অনেকভাবে উঠে এসেছে আমাদের শিল্প-সাহিত্যে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ডাক বিভাগ কোনো স্ট্যাম্প করেনি 'টোকাই' নিয়ে। টোকাইয়ের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ টোকাইকে দিয়ে একটি স্ট্যাম্প করতেই পারে। ডাক বিভাগের এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে এটি আমাদের প্রস্তাবনা।

আশা করি কর্তৃপক্ষ বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ভেবে দেখবেন।